BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03090031
Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 09| September 2025| e-ISSN: 2584-1890

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা : এক জীবননিষ্ঠ বস্তুবাদী অনুসন্ধান

Sutapa Dey[1] & Dr. Sanchita Banerjee Roy[2]

1. Research Scholar, YBN University Email-sutapa5.5.1987@gmail.com
2. Assistant Professor, YBN University

Abstract:

গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক যুগ-সচেতন শিল্পস্রষ্টা, যিনি নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সমাজবাস্তবতা এবং গণসংগ্রামকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছিল কিশোর বয়স থেকেই। তিনি দারোগার সন্তান হয়েও সরকার-বিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন এবং লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। ছোটবেলার রচনাতেও তাঁর দেশপ্রেম ও মুক্তিকামী ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল। যৌবনকাল থেকে তিনি মানুষের ন্যায় ও অধিকার সম্পর্কিত সাম্যবাদী ধারণার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শোষণমুক্ত সমাজের কল্পনা করেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না ঠিকই, তবুও তিনি মার্ক্সবাদীদের মতোই যথাযথ বস্তুবাদী দৃষ্টি দিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি বরং মহামানবতা ও মনুষ্যত্ববোধের আদর্শকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের অসাম্য ও অব্যবস্থাই ক্রোধ ও হিংসাত্মক আন্দোলনের জন্ম দেয়, তাই তিনি শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশমুক্তি ও দারিদ্র্য মুক্তির কথা বলেছেন। বস্তুত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা ও সাহিত্য আত্মসচেতন মানবিক আনন্দ, মানুষের শৃঙ্খল মুক্তি, এবং জীবননিষ্ঠ বস্তুবাদী সাহিত্যের আদর্শেরই অনুসারী ছিল।

Key Words: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রাজনৈতিক চেতনা, কমিউনিজম, মার্ক্সবাদ, মানবিকতা, শ্রেণীসংগ্রাম, স্বদেশপ্রেম, গণসংগ্রাম।*

Introduction:

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এক যুগ-সচেতন শিল্পস্রষ্টা। তিনি যেমন নিষ্ঠাবান তেমনি পরিশ্রমী। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা সম্পর্কে লিখেছেন—

"জীবনের বহিরঙ্গমূলক পটভূমিকা রচনায় ও ইহার সাময়িক বিক্ষোভে আলোড়িত গতিবেগ দ্যোতনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার বর্ণনায় বিদ্যুৎ ঝলসিয়া ওঠে, তাঁহার ইতিহাসবোধ জীবন্ত ও জ্বলন্ত, তাঁহার আবেগ প্রকাশের ভাষা সাংকেতিকতার রহস্যে ভাস্বর, তাঁহার রাজনৈতিক চেতনা সূর্যকরদীপ্ত হিমাচল-শৃঙ্গের ন্যায় উজ্জ্বল ও ঊর্ধ্বলোকচারী। ...জীবনের নিগূঢ় রহস্যভেদী অনুভূতির সহিত সমবায়ে ইহারা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে।"[১]

তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রত্যক্ষ সমাজবাস্তবতা এবং গণসংগ্রামের দিশারী। মন্বন্তর পীড়িত, অনাহার ক্লান্ত, অশিক্ষা জর্জরিত একদল মানুষ ও মানবিকতার অবক্ষয় গ্রস্ত একদল সুবিধাবাদী শাসককে তিনি তাঁর গল্পের ঘটনাধারে স্থান দিয়েছেন ও সর্বাগ্রে তুলে ধরেছেন। বাস্তবের সেই নিষ্ফল, অসহায় মনুষ্যত্ব প্রতিবাদের দাবীতে জ্বলে ওঠে। 'বিপ্লব' বা 'বিদ্রোহ' শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের শেষতম অস্ত্র-মুখ্য হাতিয়ার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে প্রতিরোধ, বিপ্লব আর শ্রেণীসংগ্রামকেই স্পষ্টতর করে তুলেছেন। এই প্রতিরোধ, বিপ্লব আর শ্রেণীসংগ্রাম যে তাঁর সাম্যবাদী ভাবনারই ফল।

Discussion:

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটেছিল তাঁর কিশোর বয়স থেকেই। আত্মজীবনী 'ছোটবেলার স্মৃতি'তে তিনি বলেন—

"ছোটবেলাতেই আমি রাজনীতিতে যোগ দিই। প্রথম প্রথম দাদাদের কাছে নানারকম সাহসের পরীক্ষা দেওয়া; বাজেয়াপ্ত বই লুকিয়ে সরবরাহ করা এবং নিজে পড়া। অন্য বাড়ী হলে এক কথা। পুলিশ দারোগার বাড়ীর ছেলের পক্ষে এসব কাজ করা গুরুতর অপরাধ বৈ কী!"[২]

খোদ দারোগার সন্তান হয়েও তিনি স্বাধীনতাকামী ছিলেন ও দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন। সরকার বিরোধী কাজকর্মের জন্য তাঁকে কিশোর বয়সেই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল—

"আমার বাবা ছিলেন আশ্চর্য একটি মানুষ। এসব তিনি জানতেন তবু কখনও আমাকে বারণ করেননি। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। একদিন সকালে বাড়ী ঘিরে ফেললো পুলিশ। আমরা বই কাগজপত্র লুকোবার সময় পেলাম না। কি করে ছোটবোন আনু আর ডাবু কিছু কিছু বুকের ভেতর পাচার করলো। কিন্তু বেশীর ভাগই বাড়ীতে রয়ে গেলো। আমরা গত্যন্তর না দেখে উঠোনের মাঝখানে রাখা উঁচু খড়ের তলায় চাপা দিয়ে রাখলাম। বাড়ীতে পুলিশ এলো, সার্চ করলো- কিন্তু উঠোনের ওপর নিজেদের টুপি খুলে রেখে। কিছুই পাওয়া গেল না। বেশ মনে আছে আমাকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে বেদম প্রহার করেছিল। বাবা থানার ঘরে জানালার কাছে বসে পেছন ফিরে থেকেছেন। একবারও বলেননি আর মেরো না-ছেড়ে দাও আমার ছেলেকে। মনে আছে মার খেয়ে আমার জ্বর হয়েছিল। কিন্তু এত মার দিয়েও একটি কথা বের করতে পারেনি মুখ দিয়ে।"[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই আত্মকথা থেকে বোঝা যায় যে সেদিন শাসক ইংরাজের বিরুদ্ধে পিতা ও পুত্র উভয়ের হৃদয়েই জ্বলে উঠেছিল আঘাতের জ্বালা। এই আঘাতের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে প্রত্যাঘাতের দৃঢ় পণ। দেশের টানে সেই দৃঢ়পণ গড়ে উঠেছিল তাঁর মনে। এই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। শুধু তাই নয়, বরং তাঁর ছোটবেলার সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়েও প্রকাশ পেয়েছিল দেশপ্রেম। খুব ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কবিতায়। সাত-আট বৎসর বয়সে লেখা কবিতায় ছিল মুক্তিকামী ভাবনা। এরই স্বীকৃতি আছে নিজের ছোটবেলার জীবন অবলম্বনে লেখা 'কিশোর রচনা সমগ্রে'র অন্তর্গত 'হারানো মেডেল' গল্পে। সেখানে দীপালী উৎসবে স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে রুপোর মেডেল পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার বিষয় সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন—

"দীপালীর ওপর একটা কবিতা তো লেখা গেল। কী সেই কবিতা আজ স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা অসম্ভব। কেবল মনে আছে তাতে কিছু রাজনীতির আভাস ছিল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নিয়ে খেদ প্রকাশ করা হয়েছিল, দেশমাতার জন্যে দুঃখ ছিল আর মহাকালীকে আহ্বান করে বলা হয়েছিল : আজ আমাদের দেশে শ্মশান দীপালী, কঙ্কালেরা বুকের পাঁজরে প্রদীপ জ্বেলেছে, দেবী, এরই মধ্যে তুমি আবির্ভূত হও।"[৪]

এছাড়া দশ-এগারো বছর বয়স থেকেই যে লেখকের মনে অগ্নিযুগের বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের প্রভাব পড়েছিল তাঁর রচনার মধ্যে সে স্বীকৃতিও আছে।

কালচেতনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে নানাভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তাঁর বাল্য-কৈশোরের সন্ধিস্থলে তাঁর অগ্রজ শেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন পথিক। তাঁর জীবনবোধের প্রভাব নারায়ণের উপর পড়েছিল। যৌবনকাল থেকেই মানুষের ন্যায়, অধিকার সম্পর্কিত সাম্যবাদী ধারণার সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান। মুক্তির ইচ্ছায় ভরপুর, সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গে অটল অসংখ্য মানুষ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর কথাসাহিত্যে। ব্যক্তি অপেক্ষা সমষ্টি সেখানে অধিক স্থান দখল করে নেয়। দেশ ও মনুষ্যত্বের যারা উদ্বোধক, মানুষের দাবী প্রতিষ্ঠায় যারা উৎসর্গিত প্রাণ, তাদেরই জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে তাঁর রচনা। তাঁর জন্ম সালের (১৯১৮) পূর্ব বৎসরেই সাম্যবাদী দেশ রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই রুশ প্রভাব তাঁর রচনায় যথেষ্ট পরিমানে প্রভাব ফেলেছিল। সমালোচক সমরেশ মজুমদার বলেছেন—

“মানিক বা নারায়ণ কিংবা গোপাল হালদার যথার্থ অর্থেই রুশ বিপ্লবের (১৯১৭) শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।”[৫]

রুশ বিপ্লবের প্রভাবই শুধু নয়, বরং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বস্তুচেতনা প্রচারে ইচ্ছুক ছিলেন বলে এবং রোমান্টিক অভিনবত্বে আগ্রহী ছিলেন বলেই বিশ্বব্যাপী নানা মুক্তি আন্দোলন থেকে আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন।

মন্বন্তর আক্রান্ত বাংলায় তিনি দেখেছিলেন ক্ষুধার্তের হাহাকার আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল মূল্যবোধের অবক্ষয়। পরাধীনতার গ্লানি বহন করা ভারতের সংকটের দিনে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাম্যবাদ ও শোষণমুক্ত সমাজের ছবি কল্পনা করেছিলেন। তাঁর রোমান্টিক শিল্পীমন বারেবারেই সংগ্রামকে স্মরণ করেছে, সংগ্রামের পথে সাধারণ মানুষের জয়যাত্রাকেই তিনি তাঁর রচনায় তুলে ধরতে চেয়েছেন বারংবার। সংগ্রামী মানুষের প্রতি হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরক্তি দেখিয়েছেন তিনি। শতসহস্র যন্ত্রণায় দগ্ধ মানুষ যে একদিন ঐক্যবদ্ধ হবে, তাদের সমস্ত দৈন্যের অবসান ঘটবে -এ বিশ্বাস লেখকের ছিল। তাঁর শক্তি ও সম্ভাবনা ব্রাত্য মানুষের ভাবনার অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল।

কিশোর নারায়ণের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর কলেজের সহপাঠী অচ্যুত গোস্বামী বলেছেন যে—

“নারায়ণ তখন ছিল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পরম অনুরাগী, গান্ধিজীর নীতিতে বিশ্বাসী। যুবক সমাজের উন্নতির জন্য ঋজুকঠিন ব্রহ্মচর্যের আদর্শের প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী। ...প্রথম যৌবন পর্যন্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। পারিবারিক সংস্কার, ভক্তি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্য বহন করা ছিল তাঁদের সামাজিক রীতি। এই রীতি অনুযায়ী তিনি ভক্তিমার্গে আস্থাশীল ছিলেন।”[৬]

কিন্তু যখনই তাঁর প্রত্যয় জেগেছে, ক্রমশঃ শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশে নিজের সত্যস্বরূপ ও বিশ্বাসের নিকটবর্তী হয়েছেন তখনই পূর্বতন সংস্কার ভূমি ছেড়ে এসেছেন এবং নতুন আদর্শকে বরণ করেছেন। জন-মানস ও গণ-মানসের প্রতি ভক্তিস্থাপন তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। এই আদর্শ তাঁকে দিয়েছিল মার্ক্সবাদ। তিনিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই মার্ক্সবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেম আর সাম্যচেতনা তার মধ্যে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ভক্তিমার্গীয় পরিবারের মধ্যে থেকে অগ্রজ শেখর নাথের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ঈশ্বরপ্রীতির থেকেও বড়ো মানবপ্রীতিকে। শেখরনাথের মধ্যে দিয়ে তিনি জেনেছিলেন মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে, পরাধীনতার গ্লানিকে। তার চেয়েও বড়ো কথা তিনি মানুষকে চিনেছিলেন, তৃণজীবী মানুষের দুঃখ-কষ্টকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাদের ভালোবেসেছিলেন, রাজনৈতিক অত্যাচারে আহত দেশপ্রেমিককে দেখিয়েছেন শ্রদ্ধা, দিয়েছেন আশ্রয়। সাম্যচিন্তা তাঁর মনে মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমকালে তো বটেই এমন কি যুদ্ধোত্তর কালেও কমিউনিষ্টদের নব-বাস্তবতা বোধের অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে পথ চলেছিলেন কল্লোল কালের গোপাল হালদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের মতো লেখকেরা। তাঁদের সাথেই জোট বেঁধেছিলেন ননী ভৌমিক, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরা। বলা বাহুল্য, এসময় চোরাবাজারের মুনাফার ফাঁস, মন্বন্তর আর আমলাতন্ত্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি রুখে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিষ্ট পার্টি ও গণসংগঠন। তাঁরা চেয়েছিল সকল অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে ভাঙন ধরা বাংলাকে উদ্ধার করতে। এসেছিল গণসংগ্রাম ও রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। যুদ্ধান্তেও এই কমিউনিষ্ট পার্টি আত্মশক্তিতে প্রকাশ লাভ করেছিল। ধনঞ্জয় দাস লিখেছেন—

"যুদ্ধান্তের বাংলায় যখন জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলো তখন এই কমিউনিষ্টদেরই দেখা গেল তার পুরোভাগে।"[৭]

কমিউনিষ্ট পার্টির এই লড়াইয়ে, ফ্যাসীবাদ বিরোধী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি আদর্শে বিশ্বাসী লেখকের কমিউনিজমের প্রতি প্রগাঢ় পক্ষপাত ছিল। গান্ধী আদর্শবাদী কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে কমিউনিজমের পার্থক্য সম্পর্কেও তাঁর মনে স্পষ্ট ধারণা ছিল। এসব সত্ত্বেও যে অর্থে একজন লেখক গোঁড়া কমিউনিষ্ট লেখক বলে স্বীকৃত হন, তিনি সেই অর্থে কমিউনিষ্ট ছিলেন না। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে শেষজীবনে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

"আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য নই, কোনো দিন ছিলামও না।"[৮]

তবু কমিউনিজম তাঁর রচনায় আছে, তার কারণ তিনি মার্ক্সবাদীদের মতোই যথাযথ বস্তুবাদী দৃষ্টি দিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা করেছিলেন, কোন ইজমের বশবর্তী হয়ে নয়। বস্তুবাদ বা মেটেরিয়ালিজমকে তিনি সাদা চোখে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর 'অধিকার' গল্পে ডাক্তারকে হিমাংশু সোমের করা 'তুমি কি কমিউনিষ্ট নাকি ?' -প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার শিউরে উঠে বলে—

"দোহাই দাদা, ওসব মারাত্মক বদনাম দেবেন না। বাতাসেরও কান আছে- শেষে কি বেঘোরে মারা পড়ব ? আমি নিতান্তই বাস্তুহারা-আর কোন ডেফিনেশন আমার নেই।"[৯]

এর পর ডাক্তারের বলা 'সোস্যালিজম্ না থাকলে কি সোস্যাল ওয়ার্ক সম্ভব দাদা ?' প্রশ্নটি হিমাংশু সোমের মনেও ঝড় তুলেছে। গল্পের এই কথাগুলো যেন লেখকের নিজের কথা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনার মূল সুরটিকেও এর মধ্যে থেকে অনেকখানি খুঁজে নেওয়া যায়। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"আমার যদি কোন দল থাকে -সে আমার স্বদেশ; আমার যদি কোন রাজনীতি থাকে সে আমার ভারতবর্ষ এবং মানবতা, আমার যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে তাদের জন্যই নিবেদিত। বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি-তাঁর জীবন সাধনা আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।"[১০]

শেষ জীবনে বলা এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজের রাজনৈতিক আদর্শকে চিহ্নিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং কংগ্রেসী অথবা কমিউনিজম নয়, মানবতার আদর্শকেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। তিনি চল্লিশের দশকের গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাকেই ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তৈরি এবং বুর্জোয়াতন্ত্রে চালিত হতে দেখেছিলেন। সেখানে প্রতিবাদ আর সংগ্রামের হাতিয়ারই ছিল মানুষের দাবী আদায়ের অন্যতম মাধ্যম। তিনি সেই মাধ্যমকেই তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছিলেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ-সচেতন লেখক। তিনি জানতেন লেখকের অবচেতনই নিজের মধ্যে গোটা সমাজকে ধরে রাখে। এই অবচেতন বাইরে থেকে হয় না। আরো জানতেন সমাজকে বাদ দিয়ে লেখক তৈরি হতে পারে না। তাই সমাজ জীবনে মানুষের ওপর অত্যাচার আর অবিচার নিয়ে তিনি বারে বারে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। সাইবেরিয়ার বন্দী জীবনের ভয়াবহতা আর অভিজ্ঞতা থেকে জীবন্মৃত ফিওদর দস্তয়েভস্কি জেনেছিলেন মানব সমাজের উপর জার সমাজের তিক্ত অত্যাচার, জেনেছিলেন জার নিকোলাসের বিরুদ্ধে যে কোন বিরোধিতাই হল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। 'ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট' উপন্যাসে শোষকের সেই ভয়ংকর রূপকেই দেখিয়েছেন তিনি। শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা আর ন্যায় বিচারের জন্য ভলতেয়ার সংগ্রাম করেছিলেন। তাঁর 'জাদিগ' (Zadig) উপন্যাসে সমাজের কুৎসিত রূপটাকে তুলে ধরেছিলেন তিনি। আমাদের আলোচ্য নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও সমাজের সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে 'anatomically dissect' করেছেন। ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থ যে সুবিধাভোগীদের একচেটিয়া অধিকার নয় তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর রচনায় জানিয়ে দিতে ভোলেননি। রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলনের ইতিহাস আর সাম্যবাদের শিক্ষাকে তিনি ভোলেননি।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষিত হলেও ধর্ম নির্লিপ্ত ছিল না কোন কালেই। এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থাই জন্ম নিয়েছে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যতদিন এগিয়েছে ততই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপ্তি লাভ করে বীভৎস আকার ধারণ করেছে। সাধারণ মানুষ দাঙ্গা চায় না, দাঙ্গা চায় পরোক্ষে মতদানকারী কিছু ক্ষমতাপুষ্ট মুনাফাবাজ আর দাঙ্গাবাজরা। স্বার্থান্ধতার বিদ্বেষ থেকেই সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষবাষ্পের জন্ম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করতেন সাম্প্রদায়িকতার এই ভুলকে কখনও প্রশ্রয় দিতে নেই। মানুষকে ভালোবাসা, স্বদেশের কল্যাণ আর জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সেবা করে ধন্য হওয়াই হলো মানুষের পরম ও পবিত্র কর্তব্য। তিনি বলেছেন—

"আমাদের এই ভারতবর্ষ ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীশ্চান-পার্শী যে কোন ধর্মের যে কোন বিশ্বাসের মানুষের এখানে সমান অধিকার, সমান মর্যাদা। আর ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে তো তাই। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি আমাদের এই দেশ এক মহাতীর্থ। সব ধর্ম, সব জাতি সব দেশের মানুষ যুগে যুগে এখানে মিশে গিয়ে যে মহামানবতাকে গড়ে তুলেছে-যে ঐক্য রচনা করেছে তাই তো মনুষ্যত্বের আদর্শ হওয়া উচিৎ?"[১১]

এখানেও সেই মহামানবতা ও মনুষ্যত্ববোধের আদর্শকেই খুঁজে পাই। মানুষের ভালোবাসা হল তার অন্তরের জিনিস, তাকে তুচ্ছ আচার-আচরণের দ্বারা বিচার করা যায় না। সাম্প্রদায়িকতার জাগরণকেও চিহ্নিত করেন তিনি তাঁর বক্তব্যে। বলেন—

"আমরা ভুল করি তখনই যখন বাইরের কতগুলো আচার অনুষ্ঠানকেই আমরা ধর্ম বলে ভাবি। তাই নিয়ে হানাহানি করি, কাটাকাটি করি, ভাইয়ের রক্তে মাটি ভিজিয়ে দিই। এর চাইতে বড়ো অন্যায় আর নেই। এত বড়ো অপরাধ আর হতেই পারে না। কিন্তু ধর্ম শব্দের অর্থই হল 'যা ধরে রাখে' -মানুষে মানুষে বিভেদ ঘুচিয়ে এক করে সকলকে ভালোবাসতে শেখায়।"[১২]

সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি বাইরের আচার-আচরণের কতগুলো প্রবল পার্থক্যকেই স্পষ্টায়িত করে তোলে মাত্র। 'দেশ' এর সহ-সম্পাদক ও লেখক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানান—

"সত্যিকারের আত্মীয়তা শুধু বাইরেকার সম্পর্ক নিশ্চয়ই নয়, তার আসন ভেতরে। মনের সঙ্গে যদি মিল না হয়, তাহলে রক্তের সম্বন্ধও একেবারে মিথ্যে হয়ে যায়।"[১৩]

—এ ছিল লেখকের তরুণ বয়সের অনুভব। পরিণত বয়সে এই অনুভব আরোও সু-বিস্তৃতি লাভ করেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কিশোরদের মধ্যে, ভারতের ভাবী নাগরিকদের মধ্যে সত্যবোধের জাগরণ চাইতেন, দেখতেন এক নতুন ভারতের স্বপ্ন। ঐক্যবদ্ধ

Published By: www.bijmrd.com ll All rights reserved. © 2025 ll Impact Factor: 5.7

সুন্দর ভারতবর্ষের স্বপ্ন। তারাশংকরের মতোই তিনি মানুষের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাতে চাননি। তাই তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন মানুষের একান্ত আপনজন, নিপীড়িতদের সমব্যথী। মানবতার আদর্শই তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক আদর্শ। তাই তিনি বিশ্বাসী ছিলেন সমাজতন্ত্রে। বস্তুতই কল্লোলোত্তর সাহিত্যে বিদগ্ধতা ও মানব মুক্তির প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

নারায়ণ সাহিত্যে আদর্শ, সত্য আর বস্তুনিষ্ঠার প্রতি বিশ্বাস আছে। সব ধর্ম ও রাজনীতি থেকেই আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। মার্কসীয় বিশ্বাসের মূল মন্ত্রকেও জানতেন তিনি। কি সেই মূলমন্ত্র ? গোপাল হালদার বলেন—

"সম্পদ নয়, ঐশ্বর্য নয়, সুখও নয়; কমিউনিজম চায় আত্মসচেতন মানবিক আনন্দ। আজকের শ্রমিক সংগ্রাম ক্রমে এগিয়ে যাবে শ্রেণীহীন সমাজ বিন্যাসে, শ্রেণীহীন সমাজকে সার্থক হতে হবে সার্বজনীন সংস্কৃতির বিকাশের মধ্যে সার্থকতর হবে সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতিতে, সম্পূর্ণ হবে মানবতায়, মানুষের অক্ষয় প্রেমে। History will begin and pre history will end."[১৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা ও সাহিত্য এই পথ ও মতেরই অনুসারী। লেখক নারায়ণ নিজেই তাঁর 'তিমির তীর্থ' উপন্যাসে বলেছেন—

"অন্ধকার আর অসীম আকাশ ইহারই মধ্য দিয়া মুকুলের সমস্ত দৃষ্টি যেন সমস্ত দেশ, মহাদেশ, জাতি, মহাজাতির অন্তরের চিরন্তন সত্যটিতে গিয়া পৌঁছিয়াছে। শুধু দারিদ্র্য-শুধু হীনতা, শুধু ক্ষুদ্রতা। তিলতিল করিয়া জীবন ক্ষয় হইতেছে, চলিতে চলিতে প্রতি পায়ে শৃঙ্খল ঠন্ ঠন্ করিয়া গণদেবতাকে বিদ্রুপ করিতেছে, শাসনের নির্মম শোষণে বিশ্বমানবের রক্ত দিনের পর দিন কণায় কণায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।"[১৫]

মানবতার এই ক্ষয়কে সত্যকার উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করেছিলেন লেখক। তবুও তিনি জানেন একদিন অত্যাচারের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভেঙে যাবে, দুর্বিনীতের দম্ভ আর উদ্ধত মুষ্টি ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। সংঘবদ্ধ মানুষের সংকল্প আর কর্মোদ্যোগ সেই নতুন পৃথিবীর আশ্বাসকেই বহন করে এনেছে।

বুদ্ধিদৃপ্ত লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জানেন যে শিক্ষা মানুষের জীবনকে গড়ে তোলে, তার ন্যায্য পাওনা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, অপরের প্রতি সহিষ্ণু হতে শেখায়, ধনী ও গরীবের দ্বন্দ্বে গরীবকে সাহস যোগায়, মানব মুক্তির পথকেও ত্বরান্বিত করে। তিনিও তাই দেশমুক্তি ও দারিদ্র্য মুক্তির জন্য চাইতেন শিক্ষার উন্নতি। এজন্যই শিক্ষাকে সর্বপ্রকার কলুষ মুক্ত করার কথা বলেছিলেন তিনি। 'সুনন্দ' ছদ্মনামে লিখেছেন—

"দুর্নীতি এবং কু-শিক্ষার পথ বন্ধ করতে হবে, দেশের সর্বাঙ্গীণ স্বার্থের কথা ভেবেই শিক্ষাকে কলুষমুক্ত করতে হবে।"[১৬]

তাঁর নিজের গল্প-উপন্যাসের বহুস্থলেও আদর্শ শিক্ষকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের দুঃখ দুর্দশাকে তিনি নিজের শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর শিক্ষক চরিত্ররা সাধারণ অর্থে শিক্ষক নন। আত্ম উদ্বোধনে, দেশপ্রেম সম্প্রচারে, মানুষের আত্মিক জাগরণের মন্ত্র এঁরা দেন। বৃত্তিগত অর্থে শিক্ষাপ্রদানে এঁরা কেউই আগ্রহী নন-শিক্ষা দানের মধ্যে দিয়ে চরিত্র গঠন, দেশ ও জাতিকে উপলব্ধির মহান গৌরবে পৌঁছে দেওয়া ও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনেই তাঁরা বেশি আগ্রহী। লেখক তাঁর নিজের আগ্রহ ও রাজনৈতিক আদর্শকে অনুপ্রবিষ্ট করেন তাঁর শিক্ষক-নায়ক চরিত্রের মধ্যে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা দিনে দিনে অনেক সংকটের সম্মুখীন হয়েছি। অর্থনৈতিক সংকটকে অনেক বেশি অসহনীয় করে তুলেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। আত্মবিশ্লেষণ ও উদার মনোভাব নিয়ে বিচারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

রাজনৈতিক বাধা ও সামাজিক বাধাকে অতিক্রম করে দেশ ও জাতির সমস্যা ও সমাধানের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবনের সময় এসেছিল। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৪৮), ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬১), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫), ১৯৬৫-৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলনকে উপলব্ধি করেছিলেন লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন এঁদের অন্যতম। তিনি দেখেছেন ভাষা আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন। 'ভারতরক্ষা আইনে' চলেছিল পুলিশের দমননীতি। ১৯৬৬ তে এলো রাজনৈতিক উৎক্রান্তি পর্ব। ১৯৬৭ তে দেশজুড়ে কংগ্রেসী একাধিপত্যকে ভেঙে অধিকাংশ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল অ-কংগ্রেসী সরকার। পশ্চিমবঙ্গে এলো যুক্তফ্রন্ট। এসব কিছুকেই উপলব্ধি করেছিলেন মর্মে মর্মে তৎকালীন লেখক সম্প্রদায়। ষাটের দশকের সেই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাসকে অনুভব করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও।

এ সময় সাংবাদিক সুনন্দ দেখেছেন যুদ্ধের বিভীষিকা। পৃথিবী আর একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে দেখে বলেছিলেন—

"এক-একটা যুদ্ধ আসে, মানুষের ইতিহাসকে একটা শতাব্দীর জন্যে অভিশপ্ত করে দিয়ে যায়। আজও নাগাসাকি হিরোসিমার গামা রশ্মির হনন ক্রিয়ার বিরাম নেই-তার মৃত্যুবীজ এখনো বয়ে আনছে নিরপরাধ নবজাতক। অথচ নিতান্ত ছোটখাটো একটি পারমানবিক বোমার ব্যয়ে কমপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণীর হাসপাতাল অথবা গোটা পঁচিশেক হেলথ্ সেন্টার গড়ে তোলা সম্ভব। আর যে বোমারু বিমান সেই বোমা বহন করে, বিশুদ্ধ বিনাশলীলা ছাড়া আর কোন পূণ্যকর্ম যার জানা নেই-তার একটির মূল্যে অনায়াসেই অন্ততঃ পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ তৈরী করা চলে। এসব হিসেব বৈজ্ঞানিকেরা বারে বারে শুনিয়েছেন। দু-দুটো যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পৃথিবীর স্নায়ু এখনো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, আমাদের ভারতবর্ষের বুকে রক্তের চিহ্ন এখনো শুকোয়নি, মন্বন্তরের কংকালেরা এখনো নিঃশেষে মিলিয়ে যায়নি ধুলোতে। তবু ধর্মান্ধতা, পররাজ্য গ্রাসের লোভ, দুর্বৃদ্ধি আর অতিরিক্ত অস্ত্রলাভের অসহিষ্ণুতা-মুহূর্তে ইতিহাসের সব শিক্ষাকে ভুলিয়ে দেয়। তখন আত্মঘাতী আগুন জ্বালিয়ে তোলা এবং প্রতিবেশীর ঘরে তাকে ছড়িয়ে দেবার নির্বোধ উল্লাস অন্ধ করে দেয় মানুষকে।"[১৭]

যুদ্ধবাদী রাজনীতির স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন বলেই মানবজাতির শুভবুদ্ধির কাছে তাঁর প্রার্থনা ছিল—

"এই মূঢ়তা শেষ হোক্, হানা বন্ধ হোক্, শান্তি আসুক। পাকিস্তানী মানুষের হাতে রাইফেল না দিয়ে তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি-জীবিকার পথ প্রসারিত করো হোক্।"[১৮]

তিনি বিশ্বাস করতেন শান্তি ও ঐক্যের শক্তিতে ভারতবাসী বিদেশী হানাদারদের পরাস্ত করবে। ভারতের ঐতিহ্য ও অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করে তিনি বলেছেন—

"যুদ্ধ ভারতবর্ষ কখনো চায়নি কোনদিন চায় না। যে মহারাজ চক্রবর্তী সম্রাটের স্তম্ভ থেকে তার প্রতীক চিহ্ন আহরিত ইউরোপের ঐতিহাসিক তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাটের শ্রদ্ধার্ঘ দিয়েছেন। তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ধর্মান্ধতার সেই spring Board নয় যা থেকে প্রতিবেশীর কাঁধে যখন ইচ্ছে লাফিয়ে পড়া চলে। সেই ধর্মরাজ্যে ছিল সব ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য ঔদার্য, সব বিশ্বাসের মধ্যে মৈত্রী, সর্বব্যাপী কল্যাণের সাধনা। আজও ভারতের ত্রি সিংহশীর্ষে এবং পঞ্চশীলে তারই অনুবর্তনের প্রতিশ্রুতি।"[১৯]

ভারতের সেই মহান ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে ভাতৃত্বের প্রীতিও পারস্পরিক বন্ধনে। তাই বলেছেন—

"বিশ্রাম যাবে, দুঃখ সইতে হবে- দেশের মাটির কাছে যে মাতৃঋণ তার জন্যে পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের দায়িত্ব নিতেই হবে। দেশের দুঃখসময়ে যে আত্মপর-সে তো অমানুষ, সে দেশদ্রোহী। আজ ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-ক্রীশ্চান-জৈন-শিখ-পারসী

দেশপ্রেমের রক্তসূত্রে হৃদয়ে হৃদয়ে বন্ধন রচনা করুক। মৃত অতীতের ধর্মান্ধতার প্রেতকে অধিনায়ক করে যে আগ্রাসী জঙ্গীবাদ আমাদের শান্তিকে আঘাত করতে চাইছে-সত্যের প্রতিঘাতে তাকে স্তব্ধ করে দিক।”[২০]

স্বাধীনতার অর্থ যে কেবল রাজনৈতিক মুক্তি নয় বরং দারিদ্র্য ও অশিক্ষা থেকে মুক্তি তা যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বুঝেছিলেন এবং শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মুক্তিবোধ গড়ে তোলার কথা বলেছিলেন সেকথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তিনি চাইতেন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষাই পারে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে আরো শুদ্ধ ধারণার সম্প্রসারণ ঘটাতে, মানবকে জ্ঞান ও মুক্তির লক্ষ্যে আরো বেশি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাই তিনি বলেছেন—

“আজ যদি আমরা ইংরেজীও ভুলি, তাহলে আমাদের আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রীয় ভাষায় বিশ্বচিন্তার ভাণ্ডার থেকে মাত্র কয়েকটি কণাই কুড়িয়ে আনতে পারবো। তাতে তো ক্ষিধে মিটবেই না, বরং আত্মিক দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে।”[২১]

বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তাশীল লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন বাঙালীর অবক্ষয় ও নৈতিক পতন। ছাত্র সমাজের অশুভ রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সমস্যা, সরকারী দৈন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও হিংসাত্মক আন্দোলন আশঙ্কিত করেছিল তাঁকে। বাঙালীর আত্মিক অবসাদ, বেকারত্বের যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছিলেন তিনি। তাই বলেছেন—

“বাঙালী ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল চোখের আলো দিন দিন যেন ম্লান হয়ে আসছে। বাঙালী বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় কি শিথিল অবসাদ। সাহিত্যে কি আশ্চর্য নীরক্ততা। রাজনৈতিক চিন্তার রেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট, নেতৃত্বে দূর্বলতর। সবাই যেন বর্তমানের ভেতরে কোন মতে গা ভাসিয়ে চলেছে, ভবিষ্যতের কথা সে ভাবতে চায় না, ভাবতে তার ভয় করে। অন্তত বাঙালী মধ্যবিত্তের প্রধান চেহারাটা এই। দেশদ্রোহী মানবদ্রোহী আত্মতন্ত্রতা; দুর্শনহীন সাহিত্য; অস্তিত্বের ভার টেনে চলা দৈনন্দিনতা; অবিশ্বাস সংকুচিত নেতৃত্ব আর অর্থহীন ভবিষ্যৎ- এই যদি আজকের ইতিহাস হয়, তাহলে কোনখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা ?”[২২]

অস্তিত্বের সংকটে ভোগা অবসাদগ্রস্ত, প্রতিহিংসা কামী আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত অথবা আত্মহত্যাকামী যুবসমাজকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। সমাজে দেখেছিলেন প্রেম হীনতা, কুশ্রীতা, ছলনা আর বীভৎসতা। উগ্র হিংসাত্মক আন্দোলন সে সময়ের রাজনীতিকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, ছাত্র যুব-সমাজকে করে তুলেছিল হিংস্র। এর স্বরূপ চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন—

“শুধু কি রাজনৈতিক দলগুলোই আন্দোলন তৈরি করে? ছাত্রই হোক্ আর সাধারণ মানুষই হোক্ আন্দোলনের পটভূমি তার ভেতরে আপনিই গড়ে উঠেছে তিলে-তিলে বিষ সঞ্চিত হচ্ছে তার মনে। রাজনৈতিক দলের আহান তাদের সেই অবরুদ্ধ আবেগকে মুক্তির সুযোগ দেয় মাত্র। ফলে দেখা যায় যারা আহ্বান করে- তারাও আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, অন্ধক্রোধ নিজের গতিতেই পথ চলে।”[২৩]

-এভাবেই হিংসাত্মক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। আর যুব সমাজের এই হিংসাত্মক আন্দোলন কে রোধ করার জন্যই রাজনৈতিক আদর্শের ও মানবতার দাবী করেছিলেন তিনি।

অধ্যাপক হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছাত্রদের কাছে ডিরোজিওর ন্যায় আদর্শের প্রতিমূর্তি স্বরূপ ছিলেন। যুবসমাজের মধ্যে স্বদেশপ্রেম, স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছিলেন তিনি। বিদেশী সাহিত্য পঠন-পাঠনের মাধ্যমেও সেই মানবিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই সামাজিক অন্যায় আর অনিয়মের প্রতিরোধে প্রয়াসী হতে চেয়েছিলেন। বস্তুনিষ্ঠ দার্শনিক মন নিয়ে তিনিও স্বাধীন নাগরিকত্বের গৌরব বোধকে ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ছাত্র-রাজনীতি যে ক্ষমতাপুষ্ট রাজনৈতিক দলের মদতে বিপথে চালিত হয় এবং সমাজের অসাম্য আর অব্যবস্থাই যে মানুষের মনে অসন্তোষের জন্ম

দেয়, ক্রোধান্ধ ছাত্র আন্দোলনের জন্ম দেয় সে সত্যকেও অনুধাবন করেছিলেন তিনি। আর সে কারণেই সর্বদল ও মতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছে প্রকৃত আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন তিনি। বলেছেন—

"দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ যাঁরা গড়তে চান, যে নেতৃত্বে এবং বিরোধী নেতৃত্বে লোকসভা থেকে ময়দান পর্যন্ত আমাদের ভাগ্য ভাবনায় ব্যাকুল, তাঁরা সকলের আগে আমাদের কোন একটা আদর্শ দিতে পারেন? কোন সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের নয়- একটা স্থূল, সহজ আদর্শ। যাকে আমরা আবেগ দিয়ে ভালোবাসতে পারি?"[২৪]

প্রাচীন দিনের মূল্যবোধ আর নতুনের আগমন দুটোকেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন তিনি। নতুন বিশ্বাস ও সত্যের আলোকে যুগ ও জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার সাথে সাথে বাংলার সামগ্রিক সংকটকে দূর করতে বারংবার সকল রাজনৈতিক দলকেই মত পার্থক্য দূরে রেখে এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কথায়—

"দেশের-বিশেষ করে বাংলাদেশের এই ক্ষুব্ধ তিক্ততাকে মোকাবিলা করতে হবে ...কি দক্ষিণপন্থী, বামপন্থী দল আরো যোগ্য নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে আসুন, মানুষের সামনে নিশ্চিত কোনো একটা ভবিষ্যতের রূপ তাঁরা তুলে ধরুন। তাঁরা যে কোনো একটা আদর্শকে স্পষ্ট করুন, আস্থা ফিরিয়ে আনুন, অন্ততঃ ব্যক্তিক্ষেত্রেও অনুকরণীয় হয়ে উঠুন। এক বিদ্যাসাগর, এক রবীন্দ্রনাথ, এক চিত্তরঞ্জন, এক সুভাষচন্দ্র দেশের হৃদয়কে জাগিয়ে দিতে পারতেন, এ সত্য কি এত সহজেই ভুলে যাওয়ার কথা?"[২৫]

Conclusion:

মহামানবদের আদর্শই ছিল তাঁর জীবনের বাণী। দুর্দশাগ্রস্ত বাংলার বুকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এমন কোন আদর্শবান যোগ্য নেতার আহ্বান করে গেছেন তিনি যে প্রতিবাদী ম্লান মুখে যোগাতে পারবে অধিকার আদায়ের ভাষা, রাজনীতি, সমাজ ও জীবনকে শাশ্বত সত্যের পথে, মঙ্গলের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। বস্তুতঃ, এই জীবনচেতনা এবং একটি বিশেষ পথের প্রতি বিশ্বাসজ্ঞাপন তাঁর উপন্যাস-গল্প-প্রবন্ধের মধ্যে একটি সিদ্ধান্ত রেখার মতোই সুচিহ্নিত, "আসলে জীবননিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্যই প্রগতিশীল হতে পারে-যদি তার দৃষ্টি সাম্যবাদের আদর্শে নিবদ্ধ থাকে। আর সেই সঙ্গে যদি সে যথাযথ শ্রদ্ধা নিয়ে স্বীকার করতে পারে তার বৈপ্লবিক উত্তরাধিকারকে, তাহলেই তার আদর্শ সার্থক হবে।"[২৬]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। (১৯৫৬)। বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৬৩৪

২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (২০১৪)। ছোটবেলার স্মৃতি, সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ১৩৪

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৩৪-৩৫

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (২০১৪)। হারানো মেডেল, সমগ্র কিশোর সাহিত্য, অখণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৯৯৯

৫. মজুমদার, সমরেশ। (২০২০)। বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃষ্ঠা- ২৯১

৬. গোস্বামী, অচ্যুত। (১৩৭৭)। কিশোর তারকনাথের স্মৃতি, কালি ও কলম, অগ্রহায়ণ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৬২০

৭. দাশ, ধনঞ্জয়। (১৯৭৯)। মার্কসবাদী সাহিত্য বির্তক, ১ম খণ্ড, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৫৫

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৯৬৯)। শিল্পীর স্বাধীনতা, দেশ পত্রিকা, পৌষ সংখ্যা, পৃষ্ঠা- ৮৯৫

৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৬২)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৪৪৬

১০. পূর্বোক্ত, শিল্পীর স্বাধীনতা, পৃষ্ঠা- ৮৯৭

১১. পূর্বোক্ত, সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, ডক্টর জাকির হোসেন, পৃষ্ঠা- ১২৮

১২. পূর্বোক্ত

১৩. পূর্বোক্ত, সমগ্র কিশোর সাহিত্য, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৩৬

১৪. হালদার, গোপাল। (১৯৮৩)। শেষের দিনের পদচিহ্ন, মহানগর সাহিত্য পত্রিকা, মে' সংখ্যা

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৩৫৫)। বেঙ্গল পাবলিশার্স, তিমির তীর্থ, পৃষ্ঠা- ৮০

১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (২০০১)। টিউটোরিয়াল হোম, সুনন্দের জার্নাল, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা- ২৩

১৭. পূর্বোক্ত, সুনন্দের জার্নাল, শিউলির মৃত্যু, পৃষ্ঠা- ১০

১৮. পূর্বোক্ত

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৯

২০. পূর্বোক্ত

২১. পূর্বোক্ত, সুনন্দের জার্নাল, আংরেজী হটাও, পৃষ্ঠা- ১০৩

২২. পূর্বোক্ত, সুনন্দের জার্নাল, আত্মিক অবসাদ, পৃষ্ঠা- ৮২

২৩. পূর্বোক্ত, সুনন্দের জার্নাল, দুর্দিনের ছায়া, পৃষ্ঠা- ৮৬

২৪. পূর্বোক্ত, আত্মিক অবসাদ, পৃষ্ঠা- ৮৩

২৫. পূর্বোক্ত, দুর্দিনের ছায়া, পৃষ্ঠা- ৮৭

২৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (১৯৮০)। প্রতিবিপ্লবী সাহিত্য, মার্কসবাদী বিতর্ক, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৬৩

Citation: Dey. S. & Banerjee Roy. Dr. S., (2025) "গল্পকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক চেতনা : এক জীবননিষ্ঠ বস্তুবাদী অনুসন্ধান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.